সাম্যবাদ

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’-এর মুখপত্র

৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে-জুন ২০২৩ | web: www.spbm.org | মূল্য ১০ টাকা

আওয়ামীলীগ সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ

৫ দফা দাবিতে ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’-এর স্মারকলিপি পেশ

জনগণের সমর্থন, রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে স্মারকলিপিফিরিয়ে নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ

পল্টন মোড়ে একজন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে সিএনজি থামিয়ে একদৃষ্টে বাসদ (মার্কসবাদী) দলের কর্মীদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন চালক। একজন ৫ দফা দাবি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য দিচ্ছেন। জনাদশেক কর্মী পথচলতি মানুষের কাছে আবেদন করছেন। অনেকে দাঁড়াচ্ছেন, স্বাক্ষর দিচ্ছেন। মিনিট পাঁচেক দেখে সিএনজি চালিয়ে চলে যাচ্ছিলেন অন্য যাত্রীর খোঁজে। কিছুটা এগিয়ে গাড়ির ব্রেক কষলেন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে স্বাক্ষর নেয়া এক কর্মীকে ডাকলেন। হাত বাড়িয়ে বোর্ডটা নিয়ে স্বাক্ষর দিলেন। বললেন, আপনারা খুব ভাল কাজ করছেন। কিন্তু পারবেন তো?

খিলগাঁ থাকেন গৃহিণী আমেনা বেগম। তালতলা মার্কেটের সামনে স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় মাইকে দ্রব্যমূল্য কমানো ও রেশনের দাবি শুনে ছুটে এলেন। স্বাক্ষর দিয়ে বললেন, “চলে যাচ্ছিলাম। আপনাদের বক্তব্য শুনে ঘুরে আসলাম। আপনাদের দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক। এ দাবিতে এই এলাকায় পরবর্তীতে কোন কর্মসূচী নিলে আমাকে ডাকবেন। আমি থাকব। আমরা আর টিকতে পারছি না।”

নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, দ্রব্যমূল্য কমানো ও সর্বজনীন রেশন চালু করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা করা, কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদান, সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা– এই ৫ দফা দাবিতে গত তিন মাস ধরে চলেছে স্বাক্ষর সংগ্রহ। এ সময়ে এ ধরনের অসংখ্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন দলের নেতা-কর্মীরা। ঢাকার এক কর্মী অন্য একটি কর্মসূচিতে কাজে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। অপরিচিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, আপা আজ স্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন না? কথা বলার পর জানা *(২য় পৃষ্ঠায়)*

রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে স্মারকলিপি ফেরত নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগের প্রতিবাদে

সংবাদ সম্মেলন

(৫ দফা দাবিতে তিন মাসব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচী গত ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি বরাবর স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পেশের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। স্মারকলিপি পেশের পূর্বে পল্টন মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর দুইদিন পর ৭ এপ্রিল দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানাকে ফোন করে বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে স্বাক্ষরশিট ও স্মারকলিপি ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ৯ এপ্রিল ২০২৩, রবিবার, সকাল ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যটি নিচে দেয়া হলো।)

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

‘বাসদ (মার্কসবাদী)’ আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একটা বিশেষ *(২য় পৃষ্ঠায়)*

স্বাধীনতা নিয়ে মতামতের স্বাধীনতাও হরণ!

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলসহ এই আইনে গ্রেফতারকৃত সকল বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ৭ এপ্রিল শাহবাগে ছাত্র শিক্ষক ও জনতার প্রতিবাদ

২০২৩ সালের ২৬ মার্চ। দেশের ৫২তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো। ‘দৈনিক প্রথম আলো’ পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত একটা প্রতিবেদনে সেদিন দিনমজুর জাকির হোসেনের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়। জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় প্রথম আলোর প্রতিবেদককে তিনি বলেছিলেন, “পেটে ভাত না জুটলে স্বাধীনতা দিয়া কী করুম। বাজারে গেলে ঘাম ছুটে যায়। আমাগো মাছ, মাংস আর চাইলের স্বাধীনতা লাগব।”

মন্তব্যটি সরল কিন্তু তীক্ষ্ণ। ফলে তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরবর্তী ঘটনাগুলো আমরা জানি। প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা ও সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া ও মামলা দেয়া– এই ছিল এবারের স্বাধীনতা দিবসের প্রাপ্তি।

মিথ্যা প্রচারে শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী মিডিয়া এ ঘটনার পর নতুন প্রশ্ন তুলেছেন, “স্বাধীনতা মানে কি শুধু মাছ-মাংস খাওয়া?” আবার কেউ বলছেন, “আগে মানুষ ডাল-ভাত পেলেই সন্তুষ্ট থাকতো। এখন মাছ-মাংস চাইছে। এতেই বোঝা যায় দেশের উন্নতি হয়েছে।”

গরীব মানুষ অভাবে ও কষ্টে আছে – স্বাধীনতা দিবসে একথা বললে কি স্বাধীনতাকে খাটো করা হয়? মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত হলে ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে সবাই খেতে-পরতে পারবে, শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান পাবে, কথা বলার স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে, সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদাভেদ থাকবে না। সেই স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হয়নি – একথাই দিনমজুর জাকির হোসেন তাঁর ভাষায় বলেছেন, প্রথম আলো সেটা ছাপিয়েছে। এটাই দেশের লক্ষ-কোটি মানুষের মনের কথা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি প্রায়-ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান ঘটেছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেছে মুষ্টিমেয় লোক, যারা ধনী এবং ক্ষমতাশালী হয়েছে। মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা সবচাইতে বেশি ভূমিকা রেখেছে, সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে – সেই শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ অধিকার বঞ্চিত রয়ে গেছে। *(২য় পৃষ্ঠায়)*

৫ দফা দাবিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেল তিনি এই এলাকায়ই কাজ করেন। আগেই স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষরশিট আর প্রচারপত্র নিয়ে দলের কর্মীদের একের পর এক এলাকায় ছুটে বেড়ানো দেখেছেন।

কড়াইলে স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় সামনে দাঁড়ালেন এক যুবক। বললেন, আমি এরকমই কিছু একটা খুঁজছিলাম, যারা রাস্তায় আছে, মানুষের কাছে যাচ্ছে। তিনি একটা ট্রাভেল এজন্সিতে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি তার সহকর্মী ও মেসের বন্ধুদের নিয়ে চলে আসেন সমাপনী সমাবেশে।

একইধরনের অভিজ্ঞতা চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বগুড়া, রাজশাহী, যশোর, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায়। মানুষ সমর্থন জানিয়েছেন মন খুলে, বিশেষ করে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষ।

আবার এই স্বাক্ষর সংগ্রহ অতটা মসৃণও ছিল না। স্থানীয় আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীরা স্থানে স্থানে বাধা দিয়েছে। ঢাকায় মতিঝিল, ইত্তেফাক মোড়, দৈনিক বাংলা, নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, খিলগাঁও– প্রায় সকল জায়গায় পুলিশ বাধা দিয়েছে। লালবাগে প্রথমে পুলিশ, তারপর স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর দলবল নিয়ে বাধা দিয়েছেন। মাইক ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন। শুক্রাবাদ বাজারে স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্মীদের ধরে নিয়ে পশ্চিম রাজাবাজার এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড কার্যালয়ে আটকে রেখেছে। স্বাক্ষরশিট ছিনিয়ে নিয়েছে। কলাবাগানে পোস্টার লাগানোর সময় পুলিশ ও যুবলীগ সন্ত্রাসীরা বাধা দিয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে এইসকল বাধা সত্ত্বেও স্বাক্ষর সংগ্রহ চলতে থাকে। ৫ এপ্রিল সকাল ১১টায় পল্টন মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী ফোরামের সদস্য ও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত, কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য রাজু আহমেদ, রাশেদ শাহরিয়ার এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালমান সিদ্দিকী প্রমুখ। সমাবেশ শেষে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এই সমাবেশে দলের পক্ষ থেকে ৫ দফা দাবিতে সারাদেশে গণকমিটি গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। সারাদেশে যে সকল মানুষ এই দাবিগুলোকে সমর্থন করে স্বাক্ষর দিয়েছেন, যারা স্বাক্ষর না দিলেও এই দাবি সমর্থন করেন– সবাইকে এই গণকমিটিতে সংযুক্ত হওয়ার আহবান জানানো হয়। এই গণকমিটিগুলো হলো জনগণের সংগ্রামের নিজস্ব শক্তি। এই কমিটিগুলোর নেতৃত্বে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সকল গণতান্ত্রিক দাবি আদায় ও রক্ষা করতে হবে।

স্বাধীনতার কথা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেশের বেশিরভাগ মানুষের প্রয়োজনমত 'মাছ, মাংস আর চাল' কেনার স্বাধীনতা অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা যে নেই – এটা কি 'অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা' তথ্য? দেশের জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে এটাই সত্য কিন্তু সরকারি মহলের বিবেচনা ভিন্ন। তাদের বিবেচনায় প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে, মানুষের জীবন-জীবিকা মেরে দিয়ে, লুটের মহোৎসবের মেগা প্রকল্প করাই একমাত্র সত্য প্রচার এবং সেটাই সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা। দেশের কোন সংকটই সরকার স্বীকার করেন না এবং সাংবাদিক বা অন্য কেউ এ নিয়ে ভিন্ন কোন কথা বলুক তাও তারা চান না।

কিছুদিন আগে এক মন্ত্রী বলেছেন, "মানুষ এখন তিনবেলা মাংস খেতে পারে।" অথচ মার্চ মাসেই গবেষণা সংস্থা সানেম দেশে ১৬০০ নিম্নআয়ের পরিবারের ওপর জরিপ চালিয়ে তথ্য পেয়েছে – দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৭১ দশমিক ১৯ শতাংশ পরিবার এখন প্রয়োজনের তুলনায় কম খাচ্ছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও, আয় বাড়েনি গরিব মানুষের। ফলে তাদের মধ্যে না খেয়ে থাকার প্রবণতা বেড়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি বলেছে – গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এবারের ফেব্রুয়ারিতে পরিবারপ্রতি খাবার খরচ বেড়েছে ২৫ শতাংশ।

এই যুক্তি সরাসরি তুলে ধরলে তখন তারা সারা দুনিয়ায় দাম বাড়ার কথা বলেন। কিন্তু যে কথা তারা বলেন না তা হলো, বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্য যে হারে এখন কমছে, বাংলাদেশে সে হারে কমছে না। এর কারণ আমদানী ও বিপণনে বৃহৎ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের আধিপত্য। সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণে কোন ভূমিকা নিচ্ছে না, বরং পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারা আরও বলেন না যে, উন্নত দেশগুলোসহ অনেক দেশেই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষায় বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা বা সরকারি সহায়তা কর্মসূচি আছে, বাংলাদেশে যা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে সামাজিকভাবে দুরবস্থাপন্ন মানুষের কোন তালিকা নেই। সামাজিক সুরক্ষা স্কিম যতগুলো চালু আছে সেগুলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিতরণ হয় এবং তা কিভাবে হয় পত্রিকার পাতা একটু উল্টালেই বোঝা যায়, গ্রামে যেতে হয় না। এর বেশিরভাগ টাকাই লুটপাট হয়।

বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক সংকট তার জন্য শুধু ইউক্রেন যুদ্ধ বা বিশ্বপরিস্থিতি দায়ী নয়। ব্যাংকিং সেক্টরে সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের লুটপাট, বিদ্যুৎ খাতে আমদানীকৃত তেলনির্ভর বেসরকারি আইপিপি-রেন্টাল প্ল্যান্টগুলোকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি, মেগাপ্রকল্পের জন্য ঋণের বোঝা বাড়ানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, দুর্নীতি-অপচয়সহ আভ্যন্তরীণ কারণগুলোই প্রধানত দায়ী। এসবের কারণে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা, মানসম্মত জীবনযাপনের অভাব আজো বেশিরভাগ মানুষের নিত্যসঙ্গী। কোনোমতে দু'মুঠো খেয়ে টিকে থাকা আর মানুষের মত বাঁচা এক কথা নয়। উন্নত শিক্ষা-চিকিৎসা, সামাজিক জীবন, বিনোদন, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এসবই মানুষের প্রয়োজন। আজকের বাংলাদেশে উন্নত জীবন দূরে থাক, মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সংকটে সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশায়। জনগণ ভোটাধিকার বঞ্চিত, স্বৈরতান্ত্রিক-ফ্যাসিবাদী শাসনে গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত।

অন্যদিকে 'উন্নয়নের জোয়ারে' রাতারাতি টাকার পাহাড় গড়ছে একদল লোক, ধনীদের সম্পদ ফুলে-ফেঁপে উঠছে। সর্বত্র চলছে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে, সামাজিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ ধ্বংস হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা-ভোগবাদের আগ্রাসনে, মাদক-অপরাধ প্রবণতা গ্রাস করছে যুবসমাজকে, সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মান্ধতা বাড়ছে, নারী-শিশু-বৃদ্ধরা নিরাপত্তাহীন। টিকে থাকা বা উন্নতি করার প্রতিযোগিতার অনিশ্চয়তায় সমাজে মানসিক সমস্যা বাড়ছে।

দেশের এই চিত্র ঢেকে রাখতে ও মানুষকে ভোলাতে অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার 'উন্নয়ন' ও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' প্রতিষ্ঠার ঢোল পেটাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে তারা নিজেরাই ধারণ করে না, তা তাদের কর্মকাণ্ডে পরিষ্কার। জবরদস্তি-কূটকৌশলের সাহায্যে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার কারণে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগ সুবিধা বিতরণের মাধ্যমে যে অনুগত গোষ্ঠী জন্ম দিয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল গণমাধ্যমের বড় অংশ। বেশিরভাগ টিভি চ্যানেল ও পত্রিকা তারা নানা কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রথম আলোর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও এর সাংবাদিক গ্রেপ্তার-সম্পাদক হয়রানি মিডিয়ার ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। ২০১৮ সালে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এক্ষেত্রে সরকারের বড় হাতিয়ার। সরকারের সমালোচনা করে এমন সাংবাদিক, লেখক বা রাজনৈতিক কর্মীদের 'হয়রানি' করার উদ্দেশ্যেই আইনটি ব্যবহৃত হয়। সেখানে বলা আছে – দেশের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুন্ন হয়, বিভ্রান্তির কারণ ঘটে, কারো মানহানি হয়, কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারের জন্য যে কেউ দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন। সব মহল থেকে এই কালো আইন বাতিলের দাবি উঠলেও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হওয়া আজ জরুরি কর্তব্য।

জনগণের 'মাছ, মাংস আর চাইলের স্বাধীনতা' এবং মত প্রকাশের অধিকার দুই-ই আজ বিপন্ন। আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পর থেকে যারাই ক্ষমতায় থেকেছে তারা সবাই অল্প কিছু শোষক-লুটেরাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। দুর্নীতিগ্রস্থ-গণবিরোধী এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে তারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে। শোষণ-বৈষম্যমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ যারা চান, তাদের আজ সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন শোষক-লুটেরা ধনিকশ্রেণী ও তাদের পাহারাদার দুর্নীতিবাজ-স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। গড়ে তোলা দরকার জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি।

সংবাদ সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতিতে আমাদের দলের বক্তব্য আপনাদের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন।

আপনারা জানেন, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, দ্রব্যমূল্য কমানো ও সর্বজনীন রেশন চালু করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা করা, কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদান, সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা– এই ৫ দফা দাবিতে আমাদের দল 'বাসদ (মার্কসবাদী)' এর পক্ষ থেকে দেশব্যাপী প্রায় ৩ মাস ধরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। গত ৫ এপ্রিল রাজধানীর পল্টন মোড়ে এই কর্মসূচির সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পরবর্তীতে আমরা সংগৃহীত স্বাক্ষর ও স্মারকলিপি নিয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে যাই এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে তা গ্রহণ করা হয়।

গত পরশুদিন (৭ এপ্রিল, ২০২৩) রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে আমাদের দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানাকে ফোন করে বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা ধারণা করেছিলাম উত্থাপিত দাবিসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছার পর আমরা এক ভিন্ন চিত্র দেখলাম। সেখানকার কর্মকর্তারা আমাদের স্বাক্ষর ও স্মারকলিপি ফেরত নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ শুরু করেন। অর্থাৎ কার্যতঃ তারা এই স্মারকলিপি প্রত্যাখ্যান করলেন।

কোন দাবি বা দাবিসমূহকে কেন্দ্র করে স্বাক্ষর সংগ্রহ ও স্মারকলিপি পেশ এদেশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচি। প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই এই কর্মসূচি পালন করে থাকে। আমাদের দেশে শুধু নয়, দেশে দেশে এটি একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবেই পরিচিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। গণতান্ত্রিক পথে দাবি জানানোর এটি একটি অন্যতম পন্থা।

এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের এ ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। ইতোপূর্বে এ ধরনের ঘটনা কখনও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। আমরা আরও বিস্মিত হয়েছি এই কারণে যে, এটা কেবল একটি দলীয় কর্মসূচি নয়, এখানে উত্থাপিত দাবিসমূহ এ দেশের মানুষের জ্বলন্ত দাবি এবং হাজার হাজার মানুষ একে সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর করেছেন। এই স্বাক্ষর ও স্মারকলিপিকে প্রত্যাখ্যান মানে দেশের বিপুল সংখ্যক লোকের দ্বারা স্বীকৃত দাবিগুলোকেই প্রত্যাখ্যান, হাজার হাজার জনগণের মতামতকে প্রত্যাখ্যান। দাবিসমূহ আমলে নিয়ে কোনটা বাস্তবায়ন সম্ভব, কোনটা সম্ভব নয়, কোনটা অযৌক্তিক দাবি– সেসব নিয়ে আলোচনা রাষ্ট্রপতি বা তাঁর কোন প্রতিনিধি আমাদের সাথে করতে পারতেন। গণমাধ্যমেও তাদের বক্তব্য রাখতে পারতেন। কিন্তু স্মারকলিপি প্রত্যাখ্যান করার মতো ঘটনা গণতান্ত্রিক সৌজন্যটুকু আর রাখলো না।

আমরা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং জনমনে এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ও আশঙ্কা বাড়ছে। তাছাড়া বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের তীব্রতা বেড়েছে। এই সংকটজনক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, জনগণের মতামত ও দাবিসমূহ আমরা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেছিলাম। এই ধরনের একটি পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল তাদের মতামত ও দাবি ব্যক্ত করবে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা দরকার, যার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সৌজন্যতা ও সহনশীলতা। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের এমন আচরণে জনমনে এ ধারণা আরো দৃঢ় হবে যে, সরকার ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত আর শুনতেও চাইছে না। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আঘাত করা হলো। এ দৃষ্টান্ত দেশের জন্য কোন শুভ ফল বয়ে আনবে না।

স্মারকলিপিতে উত্থাপিত দাবিগুলো আমরা মন থেকে গড়ে নিয়ে লিখিনি। এ দাবি জনগণেরই দাবি। তারা এ দাবিতে তাদের সমর্থনও ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দল তাদের কাছে দায়বদ্ধ। আমরা সম্পূর্ণ ঘটনাটি সাংবাদিকদের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরলাম।

এ কর্মসূচিতে আমরা জনগণের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি, তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি। আমাদের ভবিষ্যত সংগ্রামেও আপনাদের পাশে পাব এই প্রত্যাশা করি।

সাম্যবাদ
৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে-জুন ২০২৩

কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতিক পুঁজির আক্রমণ

গত ১১ থেকে ১৪ মার্চ ভারতের সংগ্রামী কৃষক সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া কিষাণ ও ক্ষেতমজুর সংগঠন' এর কেন্দ্রিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন'-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল 'বাংলাদেশের কৃষির উপর বহুজাতিক পুঁজির আক্রমণ ও কৃষক আন্দোলন' নিয়ে একটি বিশদ আলোচনা করেন। এই আলোচনার প্রথম অংশ কিছুটা সম্পাদনা করে আমরা 'সাম্যবাদ' এর পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলেও শাসনব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিগোষ্ঠির বদলে বাঙালি উঠতি পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী দল আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবে কৃষি সংক্রান্ত নীতি প্রায় একই থাকে। স্বাধীনতার পর 'সবুজ বিপ্লব' ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেয় আওয়ামী লীগ সরকার। প্রথমদিকে সার, বীজ, সেচ ব্যবস্থাপনার একক নিয়ন্ত্রণ ছিল 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)' এর হাতে। কিন্তু এরপর দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে আশির দশকে 'বিশ্বব্যাংক', 'আইএমএফ' এর পরামর্শে আর্থিক খাত সংস্কার (Structural adjustment program) কর্মসূচী গৃহিত হয়। যার মূল কথা ছিল বাজার উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ, ভর্তুকি প্রত্যাহার, সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ইত্যাদি। এর ফলে ধাপে ধাপে কৃষি উপকরণ ও ফসলের বাজারে রাষ্ট্রের ভূমিকা কমতে থাকে আর বাড়তে থাকে বিভিন্ন কোম্পানির বিনিয়োগ। যেমন, ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সার আমদানি ও সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রির একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল বিএডিসির হাতে। এরপর ১৯৮৪ সালে নিয়ন্ত্রণমূলক দামের ব্যবস্থা প্রত্যাহার, ১৯৮৯ সালে কারখানা ও বন্দর থেকে ব্যবসায়ীদের সার কেনার অনুমতি, ১৯৯২ সালে ব্যবসায়ীদের সরাসরি বিদেশ থেকে সার আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। একইভাবে ১৯৮৮-৮৯ সালে সেচ যন্ত্রপাতি ও পাওয়ারটিলার আমদানির ক্ষেত্রে সকল বাধানিষেধ প্রত্যাহার করে ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বীজ, কীটনাশকের ক্ষেত্রেও একইভাবে বাজার উন্মুক্ত করা হয়। একইসময়ে সরকারি ভর্তুকি কমতে থাকে। ১৯৭৯-৮০ সালে সারে ভর্তুকি ছিল ১২৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, ১৯৯২-৯৩ সালে এসে ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র আড়াই কোটি টাকায়। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৯০ সালের পর বিশেষত গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর কৃষি উপকরণের বাজার প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন কোম্পানি নির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় বহুগুণ। কৃষকরা বাড়তি উৎপাদন খরচ জোগাড় করতে এনজিও ও মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। উৎপাদিত ফসলের বাজারে প্রথমদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকায় কৃষকরা কিছুটা লাভবান হচ্ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও ক্রমশ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকে। যেমন, ১৯৯৯-২০০০ সালে সরকারিভাবে মোটা ধান-চাল সংগ্রহে ধানের পরিমাণ ছিল ৮.৯২%। ২০১০-১১ সালে সেখান থেকে নেমে ০.৯৯% হয়েছে। সরকার ধান অপেক্ষা চাল অধিক সংগ্রহ করে। ফলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান না কিনে মিল মালিক ও বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে চাল ক্রয় করে। এভাবে প্রধান ফসল ধান থেকে শুরু করে সমস্ত ফসলের বাজার অল্প কিছু সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এসকল ব্যবসায়ীরাই মূলত ফসল ও খাদ্যপণ্যের নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে কৃষক ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে।

কৃষি উপকরণ ও ফসলের বাজার অল্প কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় কৃষক উপকরণ ক্রয়ে এবং ফসল বিক্রয়ে প্রতি নিয়ত ঠকছে। কৃষকরা এ প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রস্থ হয়ে জমি-জমা বিক্রি করে ভূমিহীন কৃষক বা শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। অপরদিকে কৃষির সাথে সম্পর্কহীন এক শ্রেণির হাতে চলে যাচ্ছে ভূমির মালিকানা। জমি ভাড়া দেয়ার প্রবণতা বেড়েছে ব্যাপক হারে। গত চার দশকে বর্গা, লিজ, ভাড়া দেয়ার পরিমাণ ২০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশি-বিদেশি কর্পোরেট কোম্পানিগুলো কৃষি পণ্য উৎপাদনে সরাসরি এবং চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ করছে। শুধুমাত্র প্রাণ-আরএফএল গ্রুপেরই ১ লক্ষ চুক্তিভিত্তিক কৃষক রয়েছে। এরকম বিভিন্ন কোম্পানি এবং ব্যক্তি পুঁজির মালিকরা ফল, সবজি, চা, মাছ চাষ, পশুপালনের জন্য জমি ক্রয় বা ভাড়া নিচ্ছে। পারিবারিক কৃষি খামারগুলো ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। বিপরীতে পুঁজিপতিদের একটি অংশ কৃষিতে বিনিয়োগের ফলে বড় খামারের সংখ্যাও বাড়ছে।

কৃষিতে কর্পোরেট প্রভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রি ব্যবস্থার পরিবর্তন। ঐতিহাসিকভাবে এখানে কৃষকরাই বীজ সংরক্ষণ ও বিক্রি করত। কিন্তু গত কয়েক দশকে এক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন হয়েছে। প্রধান ফসল ধান এখন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত নির্ভর। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষক সরাসরি বীজ উৎপাদন করতে পারে না। ফলে ধান বীজের জন্য পুরোপুরি বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে ১০০০ কোটি টাকার ধান বীজ বাজারের ১৮% নিয়ন্ত্রণ করে 'সুপ্রিম সিড', বাকিটা 'বায়ার ক্রপ', 'এসিআই', 'ব্র্যাক', 'ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার' ইত্যাদি গ্রুপ। যেখানে বিএডিসি নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র ৬%। একইভাবে শাকসবজি বীজের ৩২% 'লাল তীর', ১৩% 'মেটাল', ১২% 'জামালপুর সিড' বাকিটা 'মল্লিকা সিড', 'এসিআই' সহ আরও অনেক কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে।

সেচ, চাষ, মাড়াই এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির বাজারও একইভাবে কয়েকটি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। কৃষি যন্ত্রপাতির বাজারের ৬৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, বাকি ৩৫ শতাংশ দেশে উৎপাদিত হয়। আমদানির প্রধান নিয়ন্ত্রক এসিআই, আলীম ইন্ডাস্ট্রিসহ অল্প কিছু গ্রুপ।

আধুনিক কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভরতা। সার আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে বাল্ক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, তাইবা সাইফুল্লাহ জি এল, টোটাল শিপিং এজেন্সি এবং পোটন ট্রেডার্সসহ আরও কিছু কোম্পানির সিন্ডিকেট। সারে ভর্তুকির বেশিরভাগ অর্থ আত্মসাৎ করে এসকল কোম্পানি ।

দেশে বর্তমানে কীটনাশক বাজারের ৮২ দশমিক ৫ শতাংশ বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। বাংলাদেশে বালাইনাশক ব্যবসায় বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিমিটেড, বায়ার ক্রপ সাইন্স সরাসরি বাজারজাত করে।

উপরোক্ত তথ্য ও বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় বাংলাদেশের কৃষি খাত অল্প কিছু দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজিপতিদের দখলে। এসকল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত তাদের মুনাফার স্বার্থে কৃষকদের শোষণ করছে। ফলে বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের লক্ষ্য হবে কৃষিক্ষেত্রে মুনাফালোভী পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ। কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত ফসলের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যেই আছে যুগ যুগ ধরে শোষিত কৃষক সমাজের মুক্তির পথ।

ফ্রান্সের গণআন্দোলন, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও বামপন্থীদের নবজাগরণ

মার্চের ১৯ তারিখ। প্যারিসের রাস্তায় দু'পাশে পড়ে আছে হাজার হাজার টন আবর্জনা। কারণ যারা আবর্জনা সংগ্রহ করেন, সেই শ্রমিকরা ধর্মঘটে। এ ধর্মঘটে কে যায়নি? রিফাইনারি, বিদ্যুৎ বিতরণ, পাবলিক পরিবহন, নার্স, এয়ারপোর্টের কর্মচারী, মেট্রোরেল স্টাফসহ সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘটে। এ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল জানুয়ারির ১৯ তারিখ থেকে। থেমে থেমে একদিন-দু'দিন করে চলছে ধর্মঘট। ধর্মঘটের ধারবাহিকতায় ৭ মার্চ বিক্ষোভ হয় প্যারিসে, তাতে অংশ নেন প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক।

ঘটনার সূত্রপাত ঘটে ফ্রান্সের ইমানুয়েল ম্যাঁক্রর সরকার ফ্যাসিবাদী পথে জনমত অগ্রাহ্য করে এবং পার্লামেন্টকে পাস কাটিয়ে আর্টিকেল ৪৯.৩ ধারায় পেনশন আইনকে সংশোধন করার পর থেকে। নতুন আইনে পেনশনের বয়স ৬২ বছর থেকে দুই বছর বাড়িয়ে ৬৪ বছর করা হয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর কাজের জন্য ৬০ বছরের আগে পেনশনে যাওয়ার যে বিধান ছিল সেটা বাতিল করা হয়। ইমানুয়েল ম্যাঁক্রর গণবিরোধী পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠে ফ্রান্সের আপামর জনগণ।

ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণি, সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ফ্রান্স একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। তাই মজুরি দাসত্ব ও শোষণ বঞ্চনার শিকার দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ। তবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের শোষণের সাথে ফ্রান্সের শ্রমিকদের শোষণকে মেলানো যাবে না। কারণ শ্রমিকদের যেসকল অধিকার বাংলাদেশে অবলীলায় হরণ করা যায় কিংবা দেয়ার চিন্তাও মালিকদের করতে হয় না, ফ্রান্সের পরিস্থিতিটা তেমন নয়। ইউরোপের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার নামে কিছু অধিকার সেখানকার শ্রমিকরা পেয়ে থাকেন। এই জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত পুঁজিবাদী সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই জনগণের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে। এর উদ্ভবের একটা ইতিহাস আছে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় বেকারত্বের ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি ঘটে। শ্রমিকরা পায় সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা পান সোভিয়েতের নাগরিকেরা। সমাধান হয় আবাসন সমস্যার। প্রতিষ্ঠিত হয় নারীর সমঅধিকার। প্রতিবন্ধী মানুষ পায় আমৃত্যু রাষ্ট্রীয় ভাতা, সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক অধিকারের রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সমাজ পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতে থাকে।

বিপ্লবের রাঙা পথ তখন গোটা দুনিয়ায় এঁকেবেঁকে ছুটছে। এই ঝড় তীব্র হতে থাকে পশ্চিম ইউরোপে। সেখানকার বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে শ্রেণিআন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে অতি উৎপাদনের ফলে অর্থনৈতিক মন্দার হাওয়া বইতে শুরু করে এবং শিল্প-কারখানা ঢালাও ভাবে বন্ধ হয়। শিল্প-কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা বেকার হয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় বামপন্থী-কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী আকারে রূপ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রেণি সচেতন শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যাপক আন্দোলনে ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি ও ইতালিতে তৈরি হতে থেকে বিপ্লবী পরিস্থিতি। মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র শ্রেণিসংগ্রামে রূপ নিতে থাকে। এতে শোষক বুর্জোয়া শ্রেণি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সাময়িক উদ্ধারের দাওয়াই দেন বৃটিশ অর্থনীতিবিদ কেইনস। তিনি সরকারি তহবিলের টাকা সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করার পরামর্শ দেন। এতে বাজারে অর্থ সঞ্চালন ও চাহিদা বাড়ে। আবার জনগণের কল্যাণ যে শুধু সমাজতন্ত্রই করেনা, পুঁজিবাদও করে- এটাও দেখানো যায়। পুঁজিবাদকে রক্ষার প্রয়োজনেই তখন পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মানুষের মৌলিক অধিকারের কিছু দায়িত্ব রাষ্ট্র মেনে নেয় অর্থাৎ তথাকথিত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পত্তনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বামপন্থীদের তীব্র গণআন্দোলনের মুখে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ফ্রান্সে *(৭ম পৃষ্ঠায়)*

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন

মানবসভ্যতার বিকাশের ধারায় একের পর এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে চলা আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের একটা স্তরে এসে সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিসম্পত্তি এবং সম্পত্তিকে ভিত্তি করে শ্রেণি বিভাজন। একদিকে শাসক আর একদিকে শাসিত। জন্ম নিয়েছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। এই শ্রেণিবিভাজনের প্রথম স্তরে এসেছে নির্মম শোষণমূলক দাসপ্রথা। আবার একদিন দাসপ্রথা ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের শোষণমূলক ব্যবস্থারও অবসান হয়েছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের পথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন তথা পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা। তার একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণি, অপরদিকে সর্বহারা শ্রেণি। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের পর দাসপ্রথাতে এসে মানুষের দ্বারা মানুষের যে শোষণ মানবসমাজে প্রথম জন্ম নিয়েছিল, পুঁজিবাদী সমাজেও তা অব্যাহত। সেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণের ফলে এক সর্বগ্রাসী সংকট দেশের আপামর জনসাধারণের জীবনকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। শুধু আমাদের দেশই নয়, সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের নিপীড়িত মানুষের জীবনই আজ বিপর্যস্ত এবং ক্রমাগত গভীর থেকে গভীরতর সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিশ্বের শ্রমিক-কৃষকসহ সর্বস্তরের নির্যাতিত মানুষ এই অবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দিন গুণছেন। এই শোষণমূলক পুঁজিবাদ শুধু অর্থনৈতিক সংকটই সৃষ্টি করছে তাই নয়, মানুষের সুকুমারবৃত্তিগুলিকে, মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের সৌন্দর্যকেও ধ্বংস করেছে। বহুদিন আগেই 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স দেখিয়েছিলেন যে, "মানুষের যে সমস্ত বৃত্তিকে এতদিন সকলে সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণি সেগুলির মাহাত্ম্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। পরিবারব্যবস্থার মধ্যে আবেগের আবরণকে সে ছিন্ন করে দিয়েছে, পারিবারিক সম্পর্কগুলিকে নিছক একটা আর্থিক সম্পর্কে পরিণত করেছে।" এরপর পার হয়ে গিয়েছে একশত সত্তর বছরেরও বেশী সময়। সমস্ত দিক থেকে সংকটের চেহারা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংকটের সাথে সাথে আজ সমাজের মধ্যে মনুষ্যত্বের সুন্দর দিকগুলি, মানুষের সুকুমারবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কিছুই নিঃশেষিত-প্রায়। কাব্য, সংগীত, সাহিত্য, চারুকলার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ। এই পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে সমাজকে পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। বিপ্লবের পথে ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিশ্রেণিকে উচ্ছেদ করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই কথাটি তুলে ধরে বলেছেন, 'আমরা যখন বলি, ভারতবর্ষে আজ আবার একটা বিপ্লব দরকার, ভারতবর্ষের মুক্তির দরজা খুলে দিতে হলে বিপ্লবের দরকার, সমাজ প্রগতির দ্বার খুলে দিতে হলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দরকার, তখন আমরা বলি পুঁজিবাদী লোভ, মুনাফা চক্র এবং 'মোটিভ'(উদ্দেশ্য) থেকে উৎপাদনকে, বিজ্ঞানকে, আর্টকে, সাহিত্যকে, মূল্যবোধকে, আচার-বিচারকে এক কথায় গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং বিজ্ঞান সাধনাকে মুক্ত করার কথা। শুধু মজুরের আর্থিক শোষণ থেকে মুক্তির লড়াই সমাজতন্ত্রের লড়াই নয়, পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই, গোটা উৎপাদনকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মুক্ত করার লড়াই। আমাদের মূল্যবোধ, রুচি এবং আর্ট, শিল্প-সাহিত্য সমস্ত কিছুকে পুঁজিবাদী জুলুম এবং 'মোটিভ', যা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তার থেকে মুক্তির লড়াই। এমনকী ভালবাসা, পারিবারিক শান্তির ক্ষেত্রেও মুক্তির লড়াই।" এই লড়াই সফল করতে না পারলে আমরা কেউই এই সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব না। অর্থাৎ, যতদিন এই সমাজকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত আমাদের কারোর মুক্তি নেই। কারণ, সমগ্র সমাজ মুক্ত না হলে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যক্তির মুক্তি হতে পারে না ।

তাই সচেতন মানুষ হিসাবে আমরা যারা ব্যক্তি এবং সমাজের মুক্তি চাই, বিপ্লবী না হয়ে আমরা পারি না। আর, বর্তমান সমাজ বিপ্লব মানে পুঁজিবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজ পরিবর্তনের ধারায় তা অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া মানবমুক্তির অন্য কোন সহজ রাস্তা নেই। সেই কারণেই, যে আদর্শের ভিত্তিতে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব বাস্তব রূপ পাবে তাকেই জীবনে গ্রহণ করতে হবে।

বিপ্লবী হিসাবে গড়ে উঠতে হলে আমাদের মার্কসবাদী দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে

কোনও আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করার সময় আমাদের একথা মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রতিটি ক্রিয়ার পেছনে কোনও না কোনও দর্শন কাজ করে। বেশিরভাগ মানুষই হয়ত সে সম্পর্কে সচেতন থাকেন না। তারা বুঝতে পারেন না, তাদের ক্রিয়াটা কোন্ দর্শনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু যারা বিপ্লবী হবেন, যারা শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মহান কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত করবেন, তাদের বুঝতে হবে যে, প্রত্যেকটি ক্রিয়ার মধ্যে দর্শন কাজ করে এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে তা কোনও না কোনও শ্রেণির দর্শন। যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজ একটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজ, তাই মুক্তি-পিপাসু মানুষকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে, সমাজ বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দিশা দেবে কোন্ দর্শন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, "আমরা মুক্তি চাই, আমরা এই পৃথিবীকে পাল্টাতে চাই এবং সচেতন ক্রিয়ার দ্বারা সমাজপ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে চাই। এই সচেতন ভূমিকা পালন করতে হলে আমাদের প্রকৃতি জগতের অন্তর্নিহিত নিয়মকে জানতে হবে এবং সমস্ত সমস্যার প্রকৃত কারণ বুঝতে হবে। তাই এসব দর্শনের সন্ধান আমাদের করতে হবে, যা আমাদের জীবনের নানা সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে। আমরা এমন দর্শন চাই যা সভ্যতা, সমাজ প্রগতি ও বিপ্লবের সামনে আজ যে সমস্যাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তার সমাধানের সঠিক পথ দেখাতে পারবে এবং বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পথে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদের রাস্তা প্রশস্ত করবে।" তিনি আরও দেখিয়েছিলেন, "এই জরাজীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর সংগ্রামে, নিজেদের পরিবর্তিত করে আরও উন্নত নীতি- নৈতিকতা মূল্যবোধের সংস্কৃতির আধারে গড়ে তোলার সংগ্রামে এবং অধঃপতিত বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে মার্কসবাদ আমাদের অস্ত্র, সত্যকে জানার এবং মুক্তির পথকে আলোকিত করবার হাতিয়ার, সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সংগ্রামের আলোকবর্তিকা।

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড লেনিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "মার্ক্সীয় দর্শন হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শনের সেই শীর্ষবিন্দু, যা মানবজাতি, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণির হাতে বৌদ্ধিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ারটি তুলে দিয়েছে। ...একমাত্র মার্ক্সের বস্তুবাদী দর্শনই সর্বহারা শ্রেণিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। এতকাল সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণি যে মানসিক দাসত্বের অন্ধকারে ঘুমিয়েছিল, সেখান থেকে তাদের বেরোবার পথ নির্দেশ দিয়েছে।" এই শিক্ষাকে সামনে রেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, "বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হচ্ছে আজকের সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। এই মূল দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই প্রগতির পথ নির্দেশিত হচ্ছে। এই মূল সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির বিজয় অর্জনের অর্থ হলো, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারা গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। উৎপাদন, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা সমস্ত ক্ষেত্রে এই যে বুর্জোয়া ও সর্বহারার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই, এটাই হল আজকে বহু সমাজ-দ্বন্দ্বের মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব– যে দ্বন্দ্বের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই আমার ব্যক্তিচেতনা তথা তার অস্তিত্বই আবর্তিত হচ্ছে। তাই আমার চেতনা, আমার প্রয়োজনের উপলব্ধি যখন শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রশ্নটির সাথে, শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে একমাত্র তখনই আমি বিপ্লবী। সো, আই একজিস্ট ইন রিভল্ট এগেনস্ট দি একজিস্টিং সোসাইটি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণি ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেই আমি বেঁচে আছি এবং এই লড়াই কেবলমাত্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ঘরে-বাইরে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়, রুচিতে, আচরণে– সর্বত্র এই লড়াই। আমার ভালোলাগা, আমার রুচি যা বিপ্লবের পরিপূরক; যা উৎপাদনকে, শিল্পকে, সাহিত্যকে, বিজ্ঞানকে বুর্জোয়া 'প্রিকনসেপশন' থেকে মুক্ত করার পরিপূরক তার সাথে বুর্জোয়ার উপলব্ধি, তার সংস্কৃতি, তার ধারণা, যৌন স্বাধীনতার ধারণা সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক। এই হল বিপ্লবীর অদ্ভুত অবস্থান। বিপ্লবী অবস্থানই করছে শ্রেণিসংগ্রামের তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে।

ফলে, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে যারা আত্মনিয়োগ করবেন তাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে সঠিক আদর্শের দ্বারা। তাদের গ্রহণ করতে হবে নতুন আদর্শ অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যে অনেক ধরনের বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে কেবলমাত্র একটা দর্শন নয়, সেই বিষয়টি উত্থাপন করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই বর্তমান যুগে মানুষের হাতে একমাত্র হাতিয়ার যার সাহায্যে মানুষ সমস্ত ধরনের সমস্যার উপর সঠিকভাবে আলোকপাত করতে পারে বা সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। ফলে, আমরা যেহেতু সত্য জানতে চাই, জীবন সম্বন্ধে, বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে সত্যোপলব্ধি করতে চাই, সেই কারণেই আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের চর্চা করছি। আর সত্যানুসন্ধানের জন্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনুসন্ধান ও চর্চা করি বলেই বা সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হই বলেই আমরা মার্কসবাদী।"

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে তা সর্বহারা শ্রেণীর হাতে এক অপরাজেয় হাতিয়ার

আমাদের মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদী দর্শনের দ্বারাই একমাত্র নিপীড়িত শোষিত শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি অর্জন সম্ভব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতনভাবে আমাদের বিচার করতে হবে, এই দর্শনের ভিত্তিতে আমাদের ক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে কি না। মার্কসবাদী শিক্ষা থেকে আমরা জানি, এই বিপ্লব সফল করার জন্য চাই একটি সঠিক বিপ্লবী দল। চাই সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই প্রসঙ্গে মহান লেনিনের শিক্ষাকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন, "একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। লেনিন যখন বলেছেন বিপ্লবী তত্ত্ব, তখন তিনি একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম বা পলিসি বোঝাতে চাননি, তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে বুঝিয়েছেন।" কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও দেখিয়েছেন, "এই বিপ্লবী তত্ত্ব হচ্ছে একটি দেশের বিপ্লবের বাস্তব প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার তত্ত্ব। ...ফলে, মার্কসবাদের যে বিজ্ঞান মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়ে গিয়েছেন বা পরবর্তী সময়ে লেনিন মার্কসবাদের ভাণ্ডারে যা সংযোজন করেছেন, সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, সেই লেনিনীয় শিক্ষা বা তারও পরবর্তী সময়ে স্ট্যালিন যা উন্নত করে গিয়েছেন, বা চীন বিপ্লবে মাও-সে-তুং যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন আজ বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা, যারা এখনও বিপ্লব করতে পারেন নি, তারা যদি তাঁর তাঁর দেশের বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চান, তাহলে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুংয়ের সেই শিক্ষাগুলোকেও তাদেরও একইভাবে বিকশিত, উন্নীত ও বিশেষীকৃত করতে হবে, যাতে এই শিক্ষাগুলি তাঁদের নিজ নিজ দেশের বিপ্লবী লক্ষ্যের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।"

এদেশের মাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন এবং লেনিন নির্ধারিত 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের' বর্তমান স্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বহু বিষয়কে বিকশিত, সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে অন্যান্য বহু বিষয়কে বা তার উপলব্ধিকে এক নতুন ও উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। একথাও আমরা সকলে জানি, শুধুমাত্র রাজনৈতিক- সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, এমনকী জীবন ও জ্ঞানজগতের সর্বস্তরকে ব্যাপ্ত করে, অর্থাৎ বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্যসহ সমস্ত বিষয়ে লেনিন পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই সমস্ত সমস্যাগুলিকে ব্যাখ্যা ও সমাধান করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক নতুন ও সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ উপলব্ধি গড়ে তুলেছেন। সেই কারণেই বর্তমান যুগের এই স্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার গভীর অনুশীলন ছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধারণা বা উপলব্ধি সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই, বর্তমান বিপ্লবের প্রয়োজনে এই চিন্তাধারাকেই গ্রহণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই গ্রহণ করার যথার্থতা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, "এই কথার অর্থ, একজন যা শিখল বা সত্য বলে মানলো, সে জীবনে সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করছে, অপরকে শেখাচ্ছে...সকলেই বুঝতে পারবে, শুধু পার্টি মিটিং বা আলাপ আলোচনাতেই নয়, এটাই হল তার জীবনবেদ। এই জন্যই মার্কসবাদকে বলা হয় জীবনদর্শন। এটা একটা অর্থনৈতিক তত্ত্ব শুধু নয়। মার্কসবাদ জীবনকে পরিবর্তিত করে এবং গোটা সমাজের উন্নতির জন্য লড়াই করতে শেখায়।"

মার্কসবাদের সাথে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের পার্থক্য প্রসঙ্গে মহান মার্কস নিজেই বলেছিলেন, "দার্শনিকরা এতদিন দুনিয়াকে শুধু নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু আসল কাজ হলো এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করা।" অর্থাৎ দার্শনিকরা এতদিন বিভিন্নভাবে জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদ জগতকে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সাম্যবাদ
৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে-জুন ২০২৩

শাহবাগে রংপুরের সহস্রাধিক ভূমিহীনের সমাবেশ

পুনর্বাসন ও রেশনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশ

গত ১৩ মার্চ দুপুর ২টায় রংপুরের সহস্রাধিক ভূমিহীন সমবেত হয়েছিলেন ঢাকার শাহবাগে। ভূমিহীনদের খাস জমিতে পুনর্বাসন করা, রেশনের ব্যবস্থা করা, দ্রব্যমূল্য কমানো– এই দাবিগুলোকে কেন্দ্র করে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন'– এর নেতৃত্বে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠনের সংগঠক আনোয়ার হোসেন বাবলু ও পরিচালনা করেন সংগঠক আহসানুল আরেফিন তিতু। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, 'বাসদ (মার্কসবাদ)'– এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা ও বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন। সমাবেশে উপস্থিত হতে না পারলেও সংহতি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক তানজিমউদ্দীন খান।

সমাবেশে অ্যাডভোকেট মতিন সরকার বলেন, "আপনারা একটা যৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন। আপনারা দাবির মধ্যে একথাও বলেছেন যে, ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান সংক্রান্ত আইন সংশোধন করতে হবে। এটা আমি সমর্থন করি। সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে ভূমিহীনদের খাস জমি প্রদান করার ক্ষেত্রে যে আইনগত বাধা আছে সেটা দূর করতে হবে।"

আব্দুস সাত্তার বলেন, "আপনারা অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছেন। ঢাকায় আসার পরও অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। সবই আমি শুনেছি। সরকার আপনাদের অভুক্ত রেখে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। প্রতিটি জেলা তখন রংপুরে পরিণত হবে। সকল কৃষক সংগঠনকে যৌথভাবে এই সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

কমরেড মাসুদ রানা বলেন, "আপনারা অনেক কষ্টে জীবন নির্বাহ করেন। সেই টাকা দিনের পর দিন একটু একটু করে জমিয়ে আপনারা এখানে এসেছেন। আপনাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। একইসাথে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"

সভা পরবর্তীকালে আনোয়ার হোসেন বাবলুর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন।

সারাদেশে মে দিবস পালিত

নোয়াখালীতে পুলিশের বাধা

৮ ঘন্টা কাজ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ২০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক দিন 'মে দিবস' সারাদেশে পালন করেছে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন। এ দিন ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে র‍্যালি ও এরপর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আশুলিয়ায় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে মে দিবস উদযাপিত হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন জেলায় শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন এ দিবসটি পালন করে।

নোয়াখালীতে মে দিবসের র‍্যালিতে পুলিশ বাধা দেয়। ফেডারেশনের সদস্যরা বাধা উপেক্ষা করে সমাবেশ করে।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের মিছিল-সমাবেশ

র‍্যাবের হেফাজতে জেসমিনের মৃত্যুর বিচার দাবি

র‍্যাবের হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিচার, সাংবাদিক শামস-এর নিঃশর্ত মুক্তি, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা প্রত্যাহার ও নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে গত ৩০ মার্চ বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ঢাকায় বিক্ষোভ

বীরকন্যা প্রীতিলতার ১১২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন চত্বরে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সভাপতি সীমা দত্ত। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মানস নন্দী, নাঈমা খালেদ মনিকা ও তৌফিকা দেওয়ান লিজা। অনুষ্ঠানে প্রীতিলতার জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী, আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করা হয়।

‘সাম্যবার্তা’ পত্রিকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই, ফলে এ কর্মসূচিতে উত্থাপিত দাবিগুলো রাষ্ট্রপতি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। অথচ বাসদ (মার্কসবাদী) রাষ্ট্রপতির কাছে সমাধান খুঁজছে যখন বামপন্থীসহ গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক দল বর্তমান ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থানের কথা বলছে। আবেদন-নিবেদনে এ সরকার পদত্যাগ করবে না। বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া শক্তি গণঅভ্যুত্থানের দিকে যাবে না। অভ্যুত্থানকারী জনতার দাবি ও আকাঙ্খা পূরণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অসমর্থ রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের বিপক্ষে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে তা থেকে দৃষ্টি ফেরানো বা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যই বাসদ (মার্কসবাদী) দলের এ কর্মসূচি।

একটা বিষয় প্রথমেই পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিষয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের বক্তব্যের সাথে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। আর ক্ষমতা থাকলেও যে রাষ্ট্রপতি দাবি মেনে নিতেন– এরকম হাস্যকর ভাবনাও আমাদের নেই। কিন্তু তারপরও আমরা রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি দিচ্ছি এজন্য যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংকুচিত হবার পরও, এখন পর্যন্ত সামান্য যতটুকু আইনি প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যায়– সেটুকুকে আমরা গণআন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগাতে চাইছি। হঠকারি চিন্তা না থাকলে সামান্যতম আইনি অধিকারকে কাজে লাগানোর সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে পারে না। আর একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে একটি বিপ্লবী দল কোন মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কত ক্ষমতা আছে তার প্রেক্ষিতে দাবি-দাওয়া পেশ করে না। দাবি তোলে রাষ্ট্র ও সরকারকে রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত করার জন্য। এটাই মহান লেনিনের শিক্ষা। ফলে আমরা রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনের দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছি না, বরং আমাদের সাংগঠনিক সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্যতম আইনি সুযোগকে গণআন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছি।

আমরা বিনয়ের সাথে সাম্যবাদী আন্দোলন ও একই মতামত ধারণকারী অন্যান্য দলের বামপন্থী কর্মীদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই। আমরা যতটুকু জানি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী আন্দোলন বর্তমান সরকারকে অনির্বাচিত ও অবৈধ বলে মনে করেন এবং তার পদত্যাগ দাবি করেন। বামপন্থীসহ প্রায় সকল বিরোধী দলই এই দাবি করে। আবার এও ঠিক, যে সরকারকে আমরা অবৈধ বলছি, তার কাছেই মজুরি বৃদ্ধির দাবি, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, রেশনিংসহ নানা দাবি করেছি ও করছি, সে লক্ষ্যে কর্মসূচি পালন করছি। সাম্যবাদী আন্দোলনও করছেন। প্রায় সকল বামপন্থী দল একত্রে এসকল দাবিতে আমরা হরতালও পালন করেছি (সাম্যবাদী আন্দোলনও সেখানে ছিলেন)। প্রশ্ন আসে অবৈধ সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া পেশ করে তাকে কি বৈধতা দেয়া হয়নি?

আবার, এ সরকারের পদত্যাগ চাই একথা যখন বলছি তখন সে যে পদে আছে সেটা তো স্বীকার করে নিয়েই বলছি। কারণ অগণতান্ত্রিকভাবে এ সরকারের ক্ষমতা দখল করাটাকে তো আমরা ঠেকাতে পারিনি। গোটা দেশের জনগণের মধ্যে বিগত দুটি জাতীয় নির্বাচনকে নিয়ে ক্ষোভ ছিল। তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রতিদিনের বেড়ে চলা অর্থনৈতিক কষ্ট, যুক্ত হয়েছে মত প্রকাশের অধিকার হরণের জ্বালা। এসব মিলিয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের উপর জনগণ চূড়ান্তভাবে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এই বিক্ষোভকে আন্দোলনে রূপ দিতে বামপন্থী শক্তি পারেনি। এটা আমাদের সমালোচনা নয়, আত্মসমালোচনা। কারণ আমরা এই বামপন্থী শিবিরেরই অংশ। আওয়ামী লীগকে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে আমরা বাধ্য করতে পারিনি।

এ পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ কী হবে? মার্কসবাদী অথরিটিদের কাছ থেকে আমরা জানি যে, শ্রেণিসংগ্রামের ঘনীভূত প্রকাশই হলো রাজনৈতিক সংগ্রাম। আর নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাই মার্কসবাদ। বাংলাদেশ সাম্যবাদী আন্দোলনের কাছে আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই, এ সময়ে শ্রমিক শ্রেণির সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবিটি কী হওয়া উচিৎ ? এটা কি চাল, ডাল, তেলের দাম কমানো? মজুরি বৃদ্ধি? না শুধু ব্যবস্থা বদলের সাধারণ ঘোষণা? কোনটি?

‘সাম্যবাদী আন্দোলন’–এর বিচারধারা অনুসারে ঘটনা বিচার করলে এ সময়ে একমাত্র কর্মসূচি হওয়া উচিত এই সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ! তাদের সে কর্মসূচি কোথায়? তারা এই কর্মসূচি দিচ্ছেন না কারণ হয়তো তারা জানেন যে, এটা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না।

তাহলে তারা কী করছেন? আসলে তারা কী করবেন বুঝতে পারছেন না। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য জনগণকে আহবান জানানো তাদের হঠকারি কর্মসূচি মনে হচ্ছে আর গণতান্ত্রিকভাবে দাবি-দাওয়া পেশ করার কর্মসূচিকে মনে হচ্ছে আপোষকামিতা। এমতাবস্থায় তারা চুপ করে বসে থাকাকেই একমাত্র বিপ্লবী কর্মসূচি বলে গ্রহণ করেছেন। আমরা আইনী অধিকারের সর্বোচ্চটুকু ব্যবহার করে সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্র আরও উন্মোচিত করেছি বলে আমরা আপোষকামী শক্তি হয়েছি এবং সরকারকে বৈধতা দান করছি। তারা চুপ করে বসে থেকে সরকারকে ভীষণ বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।

গোটা বামপন্থী মহল যে গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থানের কথা বলছে, সেটা আমরাও বলছি। গণঅভ্যুত্থানের কথা বলার সাথে সাথে বিভিন্ন জ্বলন্ত ইস্যুতে বামপন্থী দলগুলো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে, আমরাও করছি। আমরা শুধু একদিনের, এক বিকেলের, ছোট একটি এলাকাজুড়ে অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিক্রিয়া ও প্রচারমূলক কর্মসূচিকে সময় ও স্থানের দিক থেকে বড় ব্যাপ্তি দিয়েছি, আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করেছি। প্রেসক্লাব কিংবা পল্টনে দাঁড়িয়ে উত্থাপন করা দাবি নিশ্চয় শূণ্যে ছুড়ে দেয়া নয়, সরকারের উদ্দেশ্যেই বলা। আমরা সাংবিধানিক পদ হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করেছি মাত্র।

একটু ভেবে দেখুন। অগণতান্ত্রিকভাবে অনির্বাচিত একটি সরকার চৌদ্দ বছর অতিক্রম করল। দেশের বেশিরভাগ মানুষ এর বিরুদ্ধে থাকার পরও আমরা কার্যকর কোন প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি। আন্দোলন এখনও প্রচার-প্রোপাগান্ডার স্তরেই আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র এবং তার আইন ও শাসন কাঠামোকে স্বীকার করে আন্দোলন ভাবছি, ততক্ষণ আমরা চাই বা না চাই, এই অনির্বাচিত মন্ত্রী, এমপি এবং সকল সাংবিধানিক পদকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলে সেটা মানার কোন প্রশ্ন নেই। তখন রাষ্ট্র দখলের প্রশ্ন। এই সত্যকে মেনে নিতে না পারলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন পর্যায়ে আমরা আছি সেটা বুঝতে পারব না এবং এর প্রেক্ষিতে করণীয় নির্ধারণ করতে পারব না। এই অনির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীর কাছে দৈনন্দিন বিভিন্ন সংকটে দাবি-দাওয়া পেশ করা কিংবা এই রাষ্ট্রপতির কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করাতে উন্নতশির বিপ্লবীদের অপমানিত বোধ করার মধ্যে কোন উন্নত রাজনৈতিক চেতনা নেই, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার-বিশ্লেষণের অভাব আছে।

সকল কর্মসূচিকেই মূল রাজনৈতিক লাইনের পরিপূরক হতে হবে

সাম্যবার্তার অভিযোগ– বাসদ (মার্কসবাদী) নির্বাচনী মোহ তৈরি করছে আর ব্যবস্থা বদলের সংগ্রামকে আড়াল করছে। এই বিষয়টি আলোচিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের দিনে, পুঁজিবাদের এই তৃতীয় সাধারণ সংকটের সময়ে, প্রতিটি দেশের বুর্জোয়ারাই, তা তারা লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, উন্নত হউক বা অনুন্নত হউক, সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ও সংহত করতে নগ্নভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে সবদিক থেকে ব্যবহার করতে চাইছে। তাই যে দেশই আজ পুঁজিবাদী পথে এগোতে চাইছে অর্থনৈতিক সংকট যেমন গভীরতর হচ্ছে, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী চরিত্র প্রকট হয়ে উঠছে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে ভিত্তি করে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো গড়ে তোলা বিপ্লবী শক্তির পক্ষে একটি অপরিহার্য কাজ। দেখতে হবে কোনো বামপন্থী শক্তি এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো যখন গড়ে তুলছে তখন তাকে সে তার মূল রাজনৈতিক লাইন, অর্থাৎ পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের সাথে মেলাচ্ছে কি না। সে যদি তার কর্মসূচি ও প্রচারপত্রে, তার বক্তব্যে পুঁজিবাদবিরোধী রাজনৈতিক লাইনকে আড়াল করে– তবে সে দলের শ্রেণিচরিত্র নিয়েই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। শুধু রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক আন্দোলনকেও সে যদি অর্থনীতিবাদের গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে দেয়, তাহলে সেটা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পুঁজিবাদী শক্তিকেই শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী করে। বর্তমানে দেশে আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যারা শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনই সব সমস্যার সমাধান বলে মনে করেন, তারাও মানুষের কাছে এই সত্য আড়াল করতে চান। আমরা তা করছি কি?

রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি কর্মসূচির প্রচারপত্রটিতে ‘আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই এই জনদুর্দশা থেকে মুক্তি মিলবে কি?’– এই শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ আছে। সেখানে স্পষ্টভাবে ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া যে মুক্তি আসবে না তা উল্লেখ করা আছে এবং একটা আপেক্ষিক-ভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে গণআন্দোলনের কী সুবিধা হবে তাও দেখানো হয়েছে। বাসদ (মার্কসবাদী) এ সময়ের মূল সমস্যা পুঁজিবাদের উচ্ছেদের কথা যেমন বলছে, একইসাথে বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণির মূল দ্বন্দ্বের প্রধান দিক আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ের আহবান জানাচ্ছে। আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শুধু ব্যবস্থা বদলের কথা বললাম, কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিককে আড়ালে রাখলাম– এটা কোন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই নয়। তাই পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের বর্শামুখ আজ আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই নিক্ষেপ করতে হবে। এ দুই কর্তব্যের যে কোন একটিকে আড়াল করলে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ মার খাবে। বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলির মধ্যে দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়– একদল শুধু ব্যবস্থা বদলের স্লোগান তুলে আশু রাজনৈতিক কর্তব্য বা আঘাতের প্রধান দিককে আড়াল করছেন। আর আরেক দল আশু কর্তব্যের কথা বলে ব্যবস্থা সৃষ্ট সংকটকে আড়াল করছেন। এ দুই প্রবণতাই বিপ্লবী বামপন্থার জন্য বিপদজনক। এ দু'য়ের দ্বান্দ্বিক অবস্থান বুঝেই করণীয় ঠিক করতে হবে। আমরা আমাদের মার্কসবাদী শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সে চেষ্টাই করছি। লিফলেটে সংক্ষিপ্তভাবে দিলেও এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র প্রকাশিত আমাদের বুলেটিনে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বর্তমানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট তীব্র। মানুষ যেমন অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি চাইছে, তেমনি রাজনৈতিক সংকট থেকেও পরিত্রাণ পেতে চাইছে। তাদের কাছে রাজনৈতিক সংকটের মূল কারণ কী– সেই বক্তব্য নিয়ে যাওয়া দরকার। সেটা বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই নিয়ে যেতে হবে। গণঅভ্যুত্থানের কথা বলাই বিপ্লবী কর্মসূচি নয়, বিপ্লবী দায়িত্ব হচ্ছে সেটা জনগণকে বোঝানো ও তাদের পথে নামানো। সেই কাজ কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় করবেন তা ঠিক করা বামপন্থী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা

(৪র্থ পৃষ্ঠায় পর)

তাকে পরিবর্তন করার কথাও বলেছে। বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, এই কথার দ্বারা কেউ যদি ধরে নেন যে, মার্কসবাদীদের দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, বা উল্টোদিক থেকে কেউ যদি মনে করেন, মার্কসবাদ আসার আগে অন্য কোন দর্শন দুনিয়ার পরিবর্তনে কোন ভূমিকা পালন করেনি– তাহলে তা সঠিক নয়। তিনি বলেছেন, “আসলে মার্কস এই কথার দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, দুনিয়ার . . . ক্রিয়াকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিয়মগুলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যেভাবে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, যেটা দুনিয়াকে পাল্টাবার উপযোগী একটা সামগ্রিক ধারণার জন্ম দিয়েছে, অন্য কোন দর্শনই সে কাজ করতে পারেনি। . . . দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই প্রথম দেখিয়েছে যে, প্রকৃতি ও সমাজের নিয়ম সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সামগ্রিক ধরাণার ভিত্তিতে প্রকৃতির উপর মানুষ সচেতনভাবে ক্রিয়া করে। তার ক্ষতিকারক দিক যথাসম্ভব এড়িয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে এবং সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।” অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব যা আজকের যুগে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বা ভাবাদর্শ। এবং যা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের পঙ্গুতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে একটা নতুন শোষণহীন, শ্রেণিহীন, উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে। এই উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শোষিত-নিপীড়িত-সর্বহারা শ্রেণির ভূমিকা এবং তার ভাবাদর্শ সম্পর্কে কার্ল মার্কস বহু পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন, “দর্শন যেমন সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে তার বস্তুগত হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছে, তেমনি সর্বহারা শ্রেণি দর্শনের মধ্যে পেয়েছে তার ভাবগত হাতিয়ার।” এই উপলব্ধি, সমাজমুক্তি আন্দোলনের গভীর প্রত্যয় এবং আদর্শের অনন্যসাধারণ দিক নির্দেশক শক্তির প্রশ্নটি প্রতিভাত হয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মধ্যে। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার ভিত্তিতেই বলেছেন, “সর্বহারাশ্রেণির . . .উপর সমাজবিকাশের বর্তমান স্তরে মানবজাতিকে সমস্ত ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটি ঐতিহাসিকভাবে ন্যস্ত হয়েছে। তাই সর্বহারা শ্রেণিকে খুঁটিয়ে সবিস্তারে সত্যকে জানতে হবে, জ্ঞান জগতের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে মার্কসবাদ হলো তার শাণিত হাতিয়ার, অপরাজেয় অস্ত্র– যা শাসকশ্রেণির বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী। তাই আমাদের সকলের সামনে আজ সঠিক পথে ক্রিয়া করার জন্য একটিমাত্র দর্শন আছে– মার্কসবাদ।” *(চলবে)*

(কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ’ পত্রিকার এপ্রিল ২০২২ সংখ্যা হতে সংগৃহিত)

সাম্যবাদ
৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে-জুন ২০২৩

ফ্রান্সের গণআন্দোলন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম চালু হয়। ফ্রান্সের নাগরিকদের শিক্ষা অবৈতনিক। তারা বিনামূল্যে চিকিৎসা পান, আবাসন (বাড়ি ভাড়ার জন্য) ভাতা পান। গর্ভবতী মায়েরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা পান। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর চার মাস বয়স থেকে শিশু ভাতা চালু হয়। যেহেতু শিশু মায়ের গর্ভে খাদ্য গ্রহণ করে সেজন্য চার মাসের গর্ভাবস্থা থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রতিপালনের সমস্ত খরচ রাষ্ট্র শিশু ভাতা হিসেবে প্রদান করে। প্রতিবন্ধী নাগরিকদের আমৃত্যু প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়। নাগরিকদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এবং কর্ম হারানোর নিরাপত্তা ভাতা (নতুন চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বেসিক বেতনের ৮০% হিসেবে) প্রদান করা হয়। এ ছাড়া কর্মহীন নাগরিকগণ নিয়মিত বেকার ভাতা পান। সরকারি-বেসরকারি বা জীবনে যে কোন দিন কাজও করে নাই অর্থাৎ সবার জন্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাধ্যতামূলক পেনশন প্রদান করা হয়। ফ্রান্স সরকার খাদ্যদ্রব্য স্বল্প দামে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কৃষিখাতে ব্যাপক কৃষি ভর্তুকি প্রদান করে। রুটি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, তেল ও পানীয় দ্রব্যের উপরে বিশেষ কর ছাড় দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী জনগণের জন্য স্বল্প মূল্যে বাজারে সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পাল্টাতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কেইনসিয় মডেল থেকে সরে গিয়ে নব্য উদারিকরণ অর্থনীতি চালু করে। প্রচলন হয় মুক্ত বাজার অর্থনীতি তথা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় কর্পোরেট পুঁজির দাপটে ইউরোপের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা দিনে দিনে ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপে আজকের যে সামাজিক অস্থিরতা এটা তারই প্রতিক্রিয়া। যে কারণে গোটা ইউরোপ জুড়ে থেমে থেমেই চলছে গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘট। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও জার্মানীর চলমান বিক্ষোভ ও গণরোষ এরই ধারাবাহিকতা।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রে পেনশনের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে জনগণের শ্রম শোষণের রাষ্ট্রীয় লাইসেন্স আরও দুই বছর বৃদ্ধি করেছে। এই কালো আইনের বিরোধিতা করতে গিয়েই চলমান গণআন্দোলনের সূত্রপাত। পেনশন সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি আরও অনেক গণদাবি উঠে এসেছে। দৈনন্দিন কাজের সময়সীমা কমানো, জ্বালানীর মূল্য হ্রাস ও বেতন বৃদ্ধির দাবিও আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে ইউরোপ আমেরিকায় শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মালিকশ্রেণির মুনাফা বেড়েছে অনেক গুণ কিন্তু জনগণের আয় বাড়েনি। সে জন্য জনগণের মধ্য থেকে দাবি উঠেছে সপ্তাহে ৩২ ঘন্টা কাজ অর্থাৎ সপ্তাহে চারদিন কাজ ও তিনদিন ছুটির। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে ন্যূনতম বেতনের ২০% বৃদ্ধির দাবি আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান দাবি হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

কমিউনিস্ট রোভিয়া

ফ্রান্সের সকল শহর বন্দর ও জনপদে ঐক্যবদ্ধভাবে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। ছোট-বড় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সরকারবিরোধী গণআন্দোলন বাস্তবে গণপ্রতিরোধে রূপ নিচ্ছে। ফ্রান্সসহ ইউরোপ-আমেরিকায় সম্প্রতি ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধির ফলে জনগণের আবাসন ব্যয় আরও বেড়ে গিয়েছে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে ফ্রান্স সরকার একদিকে সামাজিক সুযোগ সুবিধা সংকুচিত করছে, অন্যদিকে সামরিক বাজেট অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে চলেছে। প্যারিসের রাস্তায় আন্দোলন কারীদের প্ল্যা-কার্ডে দেখা যাচ্ছে, Money for wages, money for pensions, not for war! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে। ফ্রান্সের রাজপথ থেকে পার্লামেন্ট, সর্বত্র একই কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তা হলো 'কমিউনিস্ট রোভিয়া' অর্থাৎ 'কমিউনিস্টদের নবজাগরণ' ঘটছে। এর অর্থ হারিয়ে যাওয়া কমিউনিস্টরা আবার জেগে উঠেছে। ফ্রান্স একসময় শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্থান ছিল। বিদ্যমান গণআন্দোলনে দেশের শ্রমিক- মেহনতি, সংগ্রামী জনতা আবার জেগে উঠেছে লড়াইয়ের মেজাজ নিয়ে ।

এই লড়াই চলতে চলতে যদি আন্দোলনে সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আন্দোলন যদি বৈপ্লবিক ধারায় আরও উচ্চতর স্তরে উঠে আসতে পারে, তাহলে চলমান এই দাবি আদায়ের গণআন্দোলন ভবিষ্যতে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে পরিণত হতে পারে।

২য় কেন্দ্রীয় সম্মেলন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জোট সক্রিয়ভাবে কাজ করছে যদিও এর পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে আর একটি প্রবণতা প্রবলতর হচ্ছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এনজিওভিত্তিক কিছু সংগঠন কাজ করছে, যাদের সাথে বিদেশি বায়ারদের সংযোগ রয়েছে। এই সংগঠনগুলোতে শ্রমিকরা তাৎক্ষণিক সুবিধার আশায় যুক্ত হচ্ছে, যা আন্দোলনবিমুখতা তৈরি করছে।

উল্লেখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে গত ৩ মার্চ, ২০২৩, শুক্রবার ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ২য় কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রমিক অধিকার আদায়, গণতন্ত্র ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লবী ধারার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলুন'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে সকাল ১১টায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। উদ্বোধন শেষে শ্রমিকদের দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুনে সুসজ্জিত একটি র‍্যালি শহীদ মিনার থেকে মেডিকেল কলেজ, বঙ্গবাজার, গুলিস্তান, পল্টন হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে এসে শেষ হয়। সম্মেলনে সামিল হওয়ার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে চা শ্রমিক, চিনিকল শ্রমিক, পাটকল শ্রমিক, ব্যাটারিচালিত যানবাহন শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, রেডিমেড দর্জি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ নানা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করে। সারারাতের ক্লান্তি মিছিলের গতি কিংবা শ্লোগানের স্বর কমাতে পারেনি। কয়েকমাস ধরে নিজেরা অর্থ সঞ্চয় করে ব্যক্তিগতভাবে রেজিস্ট্রেশন করে, গণচাঁদা সংগ্রহ করে, তহবিল গঠন করে প্রায় দেড় সহস্রাধিক শ্রমিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে যা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, আন্দোলন বিমুখতার এ সময়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শুধু অর্থনৈতিক দাবি নয়, শ্রমিক শ্রেণির আদর্শভিত্তিক সংগঠন ছাড়া শ্রমিক আন্দোলন জয়যুক্ত হবে না- এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল অংশগ্রহণকারী সকল শ্রমিকের চোখে।

এরপর বিকাল ৩টায় শুরু হয় আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায়ের সঞ্চালনায় পরিচালিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 'বাসদ (মার্কসবাদী)' এর সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (AIUTUC)' এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত, 'স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া' (AIUTUC অনুমোদিত)' এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইসমত আরা মণ্ডল, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কমরেড মানস নন্দী, 'শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ' এর সাধারণ সম্পাদক শামীম ইমাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে আনু মুহাম্মদ বলেন, "বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতি পার করছি তা বিশ্বের সব দেশেরই অভিজ্ঞতা। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষ শোষিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে জরুরি কাজ হচ্ছে শ্রমজীবীদের সংগঠিত করা। শ্রমজীবী-রাই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কিন্তু তারাই সবচেয়ে নিপীড়িত ও শোষিত। করোনাকালে অনেকে কাজ হারিয়েছে। করোনাকালে এবং যুদ্ধকালে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। গত দু-তিন বছরে সবচেয়ে বেড়েছে। সরকার বলছে, যুদ্ধের কারণে বেড়েছে। এটা ঠিক নয়। লুটপাট ও পুঁজিপতিদের সুবিধা দেওয়ার কারণেই দাম বাড়ছে। এই মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য ছিল না।"

তিনি আরও বলেন, "সরকারের মন্ত্রীদের ভাষ্য হলো রেডিও টেলিভিশন সত্য আড়াল করছে। সরকার আমেরিকা- ভারতকে খুশি রাখতে চায়। কারণ দেশের জনগণের মধ্যে তাদের ভিত্তি নেই। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের খুশি রেখে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। এজন্য তারা সুষ্ঠু নির্বাচন দিতেও ভয় পায়। জনগণের ভোটাধিকার নেই, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও নেই। একটা দেশে যখন গণতন্ত্র থাকে না, তখন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন থাকে না। তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলা যায় না। শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগ, পেটোয়া বাহিনী দিয়ে দমন করে রাখে। তাই ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার জন্য লড়াই করা ছাড়া, সংগঠিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত বলেন, "সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এদেশের মাটিতে শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যিনি নতুন দিকদর্শন তুলে ধরেছিলেন, শ্রদ্ধেয় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে। ভারতবর্ষে ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে বলে শুধু ভারতবর্ষে নয়, তার বাইরেও ব্যাপক প্রচার হচ্ছে। এই উন্নতি কেমন? মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে সঞ্চিত হচ্ছে সমস্ত সম্পদ। ভারতবর্ষে ধনিক শ্রেণি কর ছাড় পাচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ভারে জর্জরিত। একটা দেশে সত্যিই উন্নতি হচ্ছে কি না তার মাপকাঠি কী? তা কি কেবল সরকারি প্রচারের দ্বারাই নির্ধারিত হবে? সত্যিকার উন্নতির মাপকাঠি হচ্ছে ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য কমছে কি না। আপনারা জানেন, এক সময় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কাজ ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্য দিয়ে বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়েছিল। ধনী-গরিবের বিভাজন ছিল না। ফলে বৈষম্যও ছিল না। এই হচ্ছে সত্যিকারের উন্নয়ন। কিন্তু আজ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে ক্রমাগত বৈষম্য বাড়ছে।"

কমরেড মাসুদ রানা বলেন, "আওয়ামী লীগ সরকারও এদেশে উন্নয়নের গল্প প্রচার করছে। কিন্তু শ্রমজীবীদের জীবনে সেই উন্নয়নের ছাপ কতটুকু? যে শ্রমিকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, তারা শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকার পাচ্ছে না। টানা ১৪ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে বড় ব্যবসায়ীদের লুটপাটের সুযোগ করে দিচ্ছে, তাদেরই স্বার্থ রক্ষা করছে। ২০১৪ সালে একতরফা নির্বাচনের পর ২০১৮ সালে পুলিশপ্রশাসনের সহযোগিতায় নৈশভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়। এভাবে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আওয়ামী লীগ দেশে এক দলীয় আধিপত্য তৈরি করেছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। এই ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে শ্রমজীবী মানুষসহ সমস্ত স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।"

সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, চা শ্রমিকদের দীর্ঘ ১৯ দিন কর্মবিরতি, রাজপথ অবরোধসহ প্রতিরোধের মুখে মজুরি ৫০ টাকা বাড়ালেও এরিয়ার বিল নিয়ে প্রতারণা করে তাদের নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি ২৫ হাজার টাকা যৌক্তিক দাবি মানা হচ্ছে না, আপিল বিভাগের রায়কে অগ্রাহ্য করে এখনও ঢাকাসহ জেলা শহরে ব্যাটারিচালিত যানবাহন উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, নাম্বার প্লেটের যৌক্তিক দাবি মানা হচ্ছে না, ঢাকাসহ সারাদেশে রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরি না দিয়ে তাদেরকে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। নির্মাণ শ্রমিকদের পরিচয় পত্র, নিরাপত্তা ও মজুরির দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে দিনের পর দিন। হরিজন সম্প্রদায়ের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে না। শ্রমিকদের অধিকার আদায় করতে হলে সংগঠিত হয়ে লড়াই করতে হবে। পাশাপাশি যে মালিকী ব্যবস্থা শ্রমিকদের তীব্র শোষণ করছে, দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে সেই ব্যক্তিমালিকানাধীন মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিপূরক বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের পতাকাতলে শ্রমিকদের সমবেত হওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান।

সম্মেলনে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গণসংগীত পরিবেশন করে ও চা শ্রমিকদের পরিবেশনায় ঐতিহ্যবাহী কাঠি নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে জহিরুল ইসলামকে সভাপতি, মানস নন্দীকে সহসভাপতি, উজ্জ্বল রায়কে সাধারণ সম্পাদক ও মাসুদ রেজাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সাম্যবাদ

'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

শেষ পৃষ্ঠা

৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে-জুন ২০২৩

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের উদ্যোগে গত ১১ মে ২০২৩ বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। বক্তব্য রাখেন নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য ও শফিউদ্দিন কবির আবিদ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা এ যুগে মানবমুক্তির হাতিয়ার। যুগ যুগ ধরে মানুষ শোষিত বঞ্চিত হয়ে আসছে। এই শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াইও চলেছে। কিন্তু বারবার এক শোষণমূলক ব্যবস্থার বদলে আরেক শোষণমূলক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহান কার্ল মার্কস প্রথম শোষণের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে দেখান এবং সত্যিকারের মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। মহান লেনিন রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে মার্কসের তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখান। গড়ে তোলেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। মাও সে তুং চীনে বিপ্লব সফল করেন। মার্কস-এঙ্গেলস এর পরবর্তীকালে লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও সে তুং এর মতো মহান শিক্ষকেরা মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজন করেন। কিন্তু লেনিনের হাতে গড়া পার্টি একসময় সংশোধনবাদে নিপতিত হয়। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে আধুনিক সংশোধনবাদের উপসর্গ দেখা দেয়ার সময়েই এ ব্যাপারে সতর্ক করেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। আর এই আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির জন্য প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেন তিনি। এর মাধ্যমে লেনিনীয় পার্টি মডেলকে তিনি উন্নত স্তরে উন্নীত করেন। দেখান যে, এ যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদ। যারা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে চায় অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে চায় তাদের এই ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের নতুন রূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরাসহ মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারের বিভিন্ন দিকে অমূল্য সংযোজন করেছেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভারতবর্ষের মাটিতে বিশেষীকৃত করার সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে যে সংযোজন করেছেন তা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, আজকের সময়ে সর্বত্র প্রযোজ্য। বক্তারা বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেই বাংলাদেশে শ্রমিকশ্রেণির একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম এদেশে শুরু করেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তিনি আজ প্রয়াত। কিন্তু তাঁর দেখানো পথে আমরা আজও সেই সংগ্রাম জারি রেখেছি।

'সাম্যবার্তা' পত্রিকার গণঅভ্যুত্থানের গর্জন প্রসঙ্গে

'বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন' তাদের মুখপত্র 'সাম্যবার্তা' পত্রিকায় 'রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি দিয়ে নয়, গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থানের পথেই সমাধান' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 'বাসদ (মার্কসবাদী)' এর উদ্যোগে গত ৫ এপ্রিল পাঁচ দফা দাবিতে রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচির সমালোচনা করেই প্রবন্ধটি রচিত।

বাসদ (মার্কসবাদী) দলের একটি কর্মসূচী নিয়ে সমালোচনা হলেও, এর মাধ্যমে আন্দোলন ও কর্মসূচি সম্পর্কে বামপন্থীদের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিগত বিতর্ক সামনে এসেছে। মূলতঃ মন্তব্যগোছের একটি ছোট লেখা হলেও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীদের প্রয়োজনীয় সক্রিয়তার অভাবের কারণ বুঝতে এ বিষয়টি আলোচিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি।

বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসঙ্গে

'সাম্যবার্তা' পত্রিকার বক্তব্য সার-সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় যে, রাষ্ট্রপতির যেহেতু *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)*

'বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন' এর ২য় কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমিক অধিকার আদায়, গণতন্ত্র ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লবী ধারার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার

শ্রমিকের বুক চাপা কান্না আর অসহায় দীর্ঘশ্বাসে দেশের বাতাস আজ ভারী। সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের বুলডোজারের চাকায় পিষ্ট শ্রমিকের জীবন। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অবাধে চলছে লে-অফ, ক্লোজার, ডাউন সাইজিং, লক-আউট। সর্বত্র চলছে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'। চাকুরির স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তার কোনো বালাই নেই। সাময়িক নিয়োগই এখন কাজ চালানোর মোক্ষম অস্ত্র। এরই গালভরা নাম 'আউটসোর্সিং'। সরকারি কারখানার অধিকাংশই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশের সমস্ত সরকারি পাটকল বন্ধ, বস্ত্রকল বন্ধ। সরকারি চিনিকলগুলোর ৬টি বন্ধ, বাকিগুলো বন্ধের অপেক্ষায়। সরকারি ইস্পাতের কলও দুই দশক আগে বন্ধ হয়েছে। শ্রমিকের পদভারে মুখরিত জনপদ আজ বিরানভূমি। বেসরকারিকরণের নামে এসব সরকারি কারখানা এখন ব্যক্তিমালিকদের হরিলুটের বিষয়। 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' এর নামে চলছে জনগণের সম্পদ ব্যক্তি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার লোভনীয় বন্দোবস্ত। যাবতীয় শ্রম আইন দু'পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে মালিকরা। মজুরির কোন নিম্নসীমা নেই। নেই শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার আইনি রক্ষাকবচ।

বেকার শ্রমিকের পাল্লা যত বাড়ে, ততই কমে মজুরির হার। সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে মাত্র ৪২টি শিল্পের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছে, আরও ৫৮টি প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোনো নিম্নতম মজুরি নেই। অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে দেশের ৮৫ ভাগ শ্রমশক্তি কাজ করলেও শ্রম আইনের বাইরে থাকায় তাদের নিম্নতম মজুরিরও বালাই নেই। শ্রম আইনে সকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং নিজের পছন্দের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ১৭৯ ও ১৮০ ধারায় কৌশলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তিকে নানা শর্তের বেড়াজালে প্রায় অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮' অনুসারে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করতে চাইলে, মোট শ্রমিকের শতকরা ২০ শতাংশকে সেই ইউনিয়নের সদস্য হতে হবে। অথচ এ ধরনের শর্ত আরোপ সরকার স্বীকৃত আইএলও সনদের ৮৭ ও ৯৮ ধারার (সংঘবদ্ধ হওয়া, স্বাধীনভাবে সংগঠন করা ও নেতা নির্বাচনের অধিকার) পরিপন্থী। আইএলও কনভেনশনে আছে, ১০ জন শ্রমিকও ট্রেড ইউনিয়ন করতে চাইলে তাদের অনুমতি দিতে হবে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৭ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যায়।

ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন আমাদের দেশে প্রায় নেই বললেই চলে। স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা 'শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)' ক্ষমতাকেন্দ্রিক দুই সংগঠনের (শ্রমিক লীগ ও শ্রমিক দল) করতলে। বাকি ১১টি সংগঠনের বেশির ভাগ মহাজোট কেন্দ্রিক হওয়ায় এই জোট কার্যত নিষ্ক্রিয়। তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলনকে আরেক দিক থেকেও বিভক্ত করার প্রক্রিয়া বিদ্যমান, রেজিস্টার্ড ও ননরেজিস্টার্ড সংগঠনের মাধ্যমে। আমাদের সংগঠনসহ ৮টি সংগঠনের সমন্বয়ে 'শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি *(৭ম পৃষ্ঠায়)*

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র পক্ষে শফিউদ্দিন কবির আবিদ কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, e-mail: mail@spbm.org